ট্রয়ের আসল যুদ্ধ

লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

মুক্তি পেলো হলিউডের ব্লকবাস্টার 'ট্রয়'। ব্রাড পিটের মিলিয়ন ডলার মুভিটি আরো একবার স্মরণ করিয়ে দিলো হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াডে' বর্ণিত ট্রয়ের যুদ্ধের কথা। হোমারের ট্রয় প্রায় চার হাজার বছরের লিজেন্ড। স্পেশাল ইফেক্টের ব্যবহারে হলিউডের মুভিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ট্রয় যুদ্ধের সেই মহাকাব্যিক পটভূমি। কিন্তু মহাকাব্য আর মুভির মাঝামাঝিতে বাস্তবতার নির্যাস কতটুকু? বিজ্ঞানীরা এখন চেষ্টা করছেন ট্রয়ের সেই সত্যিকার স্বরূপ খুঁজে পেতে।

প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয় তুরস্কের উত্তর-পশ্চিমে পাহাড়ি চূড়ায়। অনুমান করা হয়, এখানেই অবস্থিত ছিল কিংবদন্তির ট্রয়। কিন্তু আগতদের হতাশ হতে হয়। কোথায় হোমারের বর্ণিত সেই সুউচ্চ তোরণ, সুশোভিত মিনার, অ্যাপোলো আর অ্যাথেনার মন্দির। কোথায় রাজা প্রিয়ামের সুদৃশ্য প্রাসাদ। যার জন্য এই কুরুক্ষেত্র সেই হেলেনের মর্মর পাথরের সুবিন্যস্ত কামরাই বা কোথায়। পর্যটকরা মহাকাব্যের সঙ্গে রূঢ় বাস্তবতা মেলাতে চেষ্টা করেন। সময়ের নিষ্ঠুর হাত সবকিছুকে অবিন্যস্ত করে দিয়ে গেছে বটে। তবুও বেশ বোঝা যায় এখানে এক সময় একটা দুর্গ ছিল। কিন্তু এই দুর্গ যে ট্রয়ের সেই দুর্গ নয় এটাও বোঝা যায় পরিষ্কার। মাত্র ২০০ গজ পরিসীমার এই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নিশ্চয়ই হাজার হাজার ট্রয় যোদ্ধা হেলেনের জন্য জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেনি। তাহলে কোথায় গেল হোমারের সেই ট্রয়?

শুধু পরিদর্শকরাই নয়, বিজ্ঞানীরাও এতকাল হতাশ ছিলেন ট্রয়ের হতশ্রী দেখে। কিন্তু সম্প্রতি খনন কাজের পর দেখা যাচ্ছে, না ট্রয়কে যত ছোট ভাবা হয়েছিল বাস্তবে ততটা ছোট নয়। ট্রয়ের পরিধি বাড়ছে। নতুন করে খনন কাজ চালানোর পর দেখা গেছে, শহর রক্ষা দেয়ালের বাইরে বড়সড় নগরীর অস্তিত্ব ছিল খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০ অব্দের দিকে। মনে করা হয়, এ সময়টাতেই হোমারের বর্ণিত ট্রয়ের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদরা বলছেন, এখন দেখা যাচ্ছে, যা ভাবা গিয়েছিল ট্রয় নগরী তার চেয়ে অন্তত ১৫ গুণ বড় ছিল। অর্থাৎ ট্রয়ের জনসংখ্যা ১০,০০০ হাজার হলেও ক্ষতি নেই। খুব সহজেই ধরে যেত এই শহরে। পাশাপাশি নতুন খনন কাজের পর আবিষ্কৃত হয়েছে আনকোরা সুরক্ষাপ্রাচীর, আমদানিকৃত তৈজসপত্র, তলোয়ার এবং আমদানি-রপ্তানির অনুমতিপত্রসহ আরো অনেক কিছু। অর্থাৎ যুদ্ধের সময় ট্রয় ছিল সম্পদশালী, ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র।

হোমারের বর্ণনায়, ট্রোজানদের সঙ্গে গ্রিকদের সমস্যার শুরু মিসেনিতে। মিসেনির রাজা আগামেমননের ভাই মেনেলাস বিয়ে করেছিল অনিন্দ্যসুন্দর হেলেনকে। কিন্তু দেবী আফ্রোদিতির প্ররোচনায় ট্রয়ের রাজপুত্র সুদর্শন প্যারিস ভাগিয়ে নিয়ে আসে হেলেনকে। হেলেনকে উদ্ধার করতে একাট্টা হয় গ্রিসের মিত্ররা। আগামেমননের নেতৃত্বে অদিসিউস, একিলিসসহ আরো অনেক বড় বড় যোদ্ধা হাজার হাজার রণতরী নিয়ে যুদ্ধ

যাত্রা করে। শুরু হয় ঘোরতর যুদ্ধ। চলে দীর্ঘ ১০ বছর ধরে। ট্রয়ের রাজা অর্থাৎ প্যারিসের পিতা প্রিয়াম বহু কষ্টে গ্রিকদের ঠেকিয়ে রাখেন ট্রয় নগরীর সুরক্ষা দেয়ালের ওপারে। ট্রয় অবরোধ করতে করতে ধৈর্যহীন গ্রিকরা এরপর এক অভিনব ফন্দি আঁটে। তৈরি করা হয় কাঠের বিশাল এক ঘোড়া। এর পেটের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয় কিছু গ্রিক কমান্ডোকে। এরপর পশ্চাদপসরণ করে মূল গ্রিক বাহিনী। গ্রিকরা পালিয়ে গেছে ভেবে ট্রোজানরা ঘোড়াটাকে নিয়ে যায় নগর অভ্যন্তরে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে কমান্ডোরা বেরিয়ে এসে খুলে দেয় ট্রয়ের সদর দরজা। ওঁৎ পেতে থাকা গ্রিক বাহিনী ঢুকে পড়ে ট্রয়ের ভেতর। বাকি কাহিনী সবার জানা।

আসলে যুদ্ধ করেছিল কারা এবং কিসের জন্য এটা বুঝতে হলে ফিরে তাকাতে হবে খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০ থেকে ১৬০০ অব্দের দিকে। ব্রোঞ্জ যুগের শেষ ভাগে ভূমধ্যসাগরের পটভূমিকায় চলছিল ক্ষমতার পালাবদলের খেলা, গ্রামগুলো ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। সৈন্যসহ একজোট হয়ে পরিণত হচ্ছিল একেকটা আঞ্চলিক শক্তিতে। একই সঙ্গে আশপাশের ভূমি দখল ও সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে থাকে এসব আঞ্চলিক শক্তি। ট্রয়ের বিপরীত দিকে ঈজিয়ান সাগরের অপর পাড়ে গ্রিসের দক্ষিণে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠা এমনই একটি নগররাষ্ট্র রাজা আগামেমননের মিসেনি।

ট্রয় যুদ্ধের ৩১০০ বছর পর মিসেনিতে উপস্থিত হন প্রখ্যাত জার্মান ধনকুবের এবং শৌখিন প্রত্নতত্ত্ববিদ হেইনরিখ শ্লিমেন। ১৮৭৬ সালে তিনি এখানে খনন কাজ চালান। কথিত সিংহদ্বারের ভেতরে একটা পরিখা খননের পর তিনি পাঁচটি বড় আয়তকার স্তম্ভদন্ড দেখতে পান। এগুলো ছিল কবর। ভেতরের দেহাবশেষগুলো মোড়ানো ছিল সোনায়। আরো ছিল পানপাত্র, তলোয়ার, বুকের বর্ম, মুকুট এবং অলঙ্কার। শবদেহগুলোর মুখ ঢাকা ছিল সোনার মুখোশে। কথিত আছে, এরকম একটা মুখোশ খোলার পর শ্লিমেন গ্রিসের রাজার কাছে চিঠিতে লেখেন : 'আমি আগামেমননের মুখ দেখেছি'।

ভুল করেছিলেন শ্লিমেন। যতদূর জানা যায়, আগামেমনন একটি কাল্পনিক চরিত্র। অন্যদিকে, মিসেনি এবং এখানে যেসব দেহাবশেষ ও প্রত্ননিদর্শন শ্লিমেন আবিষ্কার করেছিলেন, সেগুলো ঠিক থাকলেও এগুলোর বয়স ট্রয়ের যুদ্ধের চেয়ে কয়েকশ' বছর বেশি। শ্লিমেনের আবিষ্কার থেকে বোঝা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০ সাল থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েকশ' বছর ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী অঞ্চলে মিসেনি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। পিলোস, আর্গোস, টিরিনের মতো এরকম আরো কয়েকটি শক্তিশালী নগর রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল বৃহত্তর গ্রিক সভ্যতা। নগররাষ্ট্রগুলো ছিল যথেষ্ট সম্পদশালী। গবেষকরা বলছেন, প্রাসাদকেন্দ্রিক এই রাষ্ট্রগুলোর সুবিশাল প্রাসাদে খাদ্যগুদাম, কুমারশালা, রথরক্ষণাবেক্ষণ কারখানা, এমনকি পুরনো দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণের জন্য মোহাফেজখানাও ছিল।

মিসেনি এবং অন্য নগররাষ্ট্রগুলোর শক্তিশালী হয়ে ওঠার যথার্থ কারণও ছিল। দেশগুলো ধাতুর খনি নিয়ন্ত্রণ করতো এবং এগুলো দিয়ে ব্যবসা করতো। দক্ষিণে ক্রিট দ্বীপে মিনোয়ানরা সোনা এবং রুপা দিয়ে জিনিসপত্র বানানোর কৌশল জানতো। কিন্তু তাদের কাঁচামাল ছিল না। কাঁচামাল ছিল মূল ভূখন্ডে। আর এভাবেই শুরু হয় লেনদেন, বাণিজ্য। মিনোয়ানরা সাইপ্রাস আর মিশরের সঙ্গেও বাণিজ্য করতো। কালক্রমে মিসেনিও এতে যুক্ত হয়।

সমস্যা ছিল একটা। ক্ষমতার বলয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য ক্ষমতাধরদের সঙ্গে বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। মিসেনি ক্রমশ পূর্বদিকে বিস্তৃত হতে হতে হিটাইটদের সাম্রাজ্য ছুঁয়ে ফেলে। হিটাইটরা বর্তমান তুরস্কের অধিকাংশ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতো। রাজধানী বোগাজকয় থেকে হিটাইটরা পূর্বে এশিয়া, দক্ষিণে মিশর ও আসিরিয়া এবং উত্তরে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত এলাকার বাণিজ্যপথ নিয়ন্ত্রণ করতো। কালক্রমে এই বাণিজ্য-পথগুলো পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায়ও পণ্য আনা-নেয়ার কাজে ব্যবহৃত হতে থাকে। হিটাইটদের পুঁথিপত্র থেকে জানা যায়, এ সময় তাদের সঙ্গে বিরোধ বাধে আহিয়াওয়াদের। হিটাইটদের প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপে প্রাপ্ত মাটির উৎকীর্ণ ফলক থেকে জানা যায়, তুরস্কের পশ্চিম উপকূল ও ঈজিয়ান সাগরের তীরের বাসিন্দা এই আহিয়াওয়াদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ আর সন্ধির কথা। আজকের অধিকাংশ গবেষকের অভিমত, এই আহিয়াওয়াই হচ্ছে গ্রিসের মিসেনি।

খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০ সালের আগে মিসেনির সঙ্গে হিটাইটদের যেসব যুদ্ধ হয়েছিল তার একটি ছিল তুরস্কের উত্তর-পশ্চিমের একটি স্থানকে কেন্দ্র করে। হিটাইটদের রেকর্ডে এই

স্থানটিকে বলা হয়েছে উইলুসা। উইলুসাদের নৌপথ নিয়ন্ত্রণ ও সেনাবাহিনী গড়ে তোলার ক্ষমতা ছিল। তাই হিটাইটরা তাদের সঙ্গে যেকেনো মূল্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতো। মিসেনি এবং হিটাইটদের মধ্যে বিরোধের কারণটা এক্ষেত্রে পরিষ্কার বোঝা যায়। উইলুসার দখল বেদখল। গবেষকরা বলছেন, উইলুসার অবস্থান ট্রয়ের সঙ্গে মিলে যায়। তাছাড়া, হোমারের 'ইলিয়াডে' ট্রয়ের নাম 'ইলিয়স'। ব্রোঞ্জ যুগের গ্রিকরা সম্ভবত এর উচ্চারণ করত 'উলিওস'। উইলুসার সঙ্গে এই উচ্চারণগত মিল বেশ কাকতালীয়। এছাড়া, ট্রয়ে হিটাইট ভাষায় লেখা ব্রোঞ্জ যুগের সীলমোহর পাওয়া গেছে। এ থেকেও নিশ্চিত হওয়া যায় ট্রয় ছিল আসলে উইলুসা।

নতুন খনন কাজের পর ট্রয়ের বৃহৎ আকৃতি এই অনুমানের সত্যতা নিশ্চিত করে। ট্রয়ের সত্যিকার আয়তন জানতে প্রত্নবিজ্ঞানী কর্ফমান এই এলাকায় ভূচৌম্বকীয় স্ক্যান করেন। নগরপ্রাচীর ঘিরে ৪০০ গজ দূর দিয়ে সাপের মতো পেঁচানো একটা রেখা দেখতে পান তিনি। মাটি খুঁড়ে দেখা যায়, এটি আসলে পরিখা। সম্ভবত ধাবমান রথের গতি রুখতে খোঁড়া হয়েছিল। এছাড়া, বিজ্ঞানীরা গোলাকৃতির অসংখ্য পাথর দেখতে পান। এগুলো হচ্ছে সে যুগের মিসাইল। গুলতির মতো যন্ত্রের সাহায্যে ছুঁড়ে মারা হতো। গবেষকদের মতে, অবরুদ্ধ পক্ষ এ ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করতো। এর থেকে প্রমাণ হয়, উইসুলাকে কেন্দ্র করে ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল এবং উইসুলা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। নগরপ্রাচীরের ভেতরে বড়সড় নগরীর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। বাড়িঘরগুলোর পাথুরে ভিত, মাটির দেয়াল, কাঠের ছাদ, রান্নাঘরগুলো ব্রোঞ্জ যুগের অন্যান্য রান্নাঘরের মতো। তবে বাড়িটির ছড়ানো-ছিটানো অবস্থান দেখে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন, বহিঃশত্রুর হাতে নগরটি আক্রান্ত হয়েছিল। এছাড়া, নগরীর ভেতরে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ বসবাসের প্রমাণও পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে অপারেশন টেবিলে শায়িত এক রোগীর শব। রোগীর মাথায় অপারেশন চালানো হয়েছিল প্রাচীন পদ্ধতিতে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, রোগী সম্ভবত সমাজের এলিট অংশের সদস্য।

এতকিছুর পরও গবেষকরা অনেক কিছুর জবাব পাচ্ছেন না। অনেকের অভিমত, ট্রয় আসলে একটি নয়, নয়টি নগরী। একটির পর অন্যটি গড়ে তোলা হয়েছে। একটি অংশ দেখে মনে হয়, নগরীটি ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়েছে। অন্যটি দেখে মনে হবে, নগরীটি আক্রান্ত হয়েছিল। এছাড়া, কিংবদন্তির ট্রয়ের ঘোড়ার নামনিশানাও কোথাও পাওয়া যায়নি। যদিও পর্যটকদের বিশ্বাস ধরে রাখার জন্য সেখানে কিম্ভূতকিমাকার এক প্রাণীর মূর্তি তৈরি করে রাখা হয়েছে।

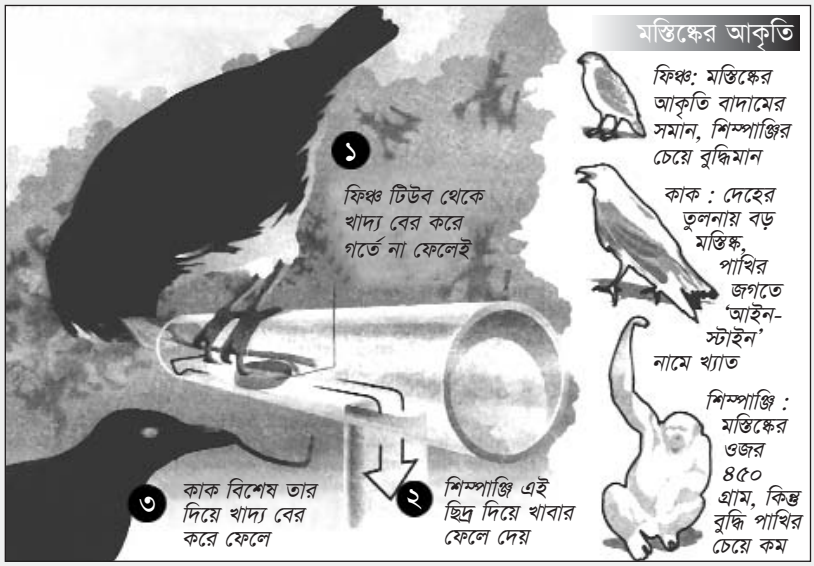

প্রাণীজগতের বুদ্ধিমান

ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এক অভিনব গবেষণা চালিয়েছেন। গবেষণার বিষয় ছিল মানুষের পরে সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণীগোষ্ঠী কারা। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, এতকাল যাদের বুদ্ধিমান বলে মনে করা হতো, সেই ডলফিন আর শিম্পাঞ্জিকে বুদ্ধির পরীক্ষায় হারিয়ে দিয়েছে পাখিরা। গবেষণায় দেখা গেছে, পাখিরা পরস্পরের ইচ্ছা বুঝতে পারে, শিম্পাঞ্জির চেয়েও কার্যকরভাবে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারে। এমনকি কোনো কিছুর কার্যকারণ সম্পর্ক বোঝার ক্ষমতা তিন বছরের মানব শিশুর সমান।

এতকাল ধারণা করা হতো, শিম্পাঞ্জির মতো মানুষের কাছাকাছি উচ্চশ্রেণীর স্তন্যপায়ী প্রাণীরাই কেবল জটিল সামাজিক সম্পর্ক এবং কাজ চালানোর জন্য যন্ত্রপাতি তৈরি করতে সক্ষম। এখন দেখা যাচ্ছে অনেক পাখির মস্তিষ্কের আকার একটা বাদামের সমান হলেও, তাদের মানসিক সক্ষমতা অনেক বড় মস্তিষ্কধারী প্রাণীর চেয়েও বেশি। জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী উলফগ্যাং উইকলার এ বিষয়ে বলেন, 'মস্তিষ্ক বড় হলেই যে বুদ্ধি বেশি হবে- এই সমীকরণ এখন আর সত্য নয়।'

পাখিরা যে শিম্পাঞ্জির মতো প্রাণীর চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, এই ধারণাটি পরীক্ষার জন্য নাথান এমেরি এবং নিকোলা ক্লেটন বিজ্ঞানী দম্পতি একটি পরীক্ষা চালান। এজন্য তারা মাঝখানে ছিদ্র আছে এমন একটি স্বচ্ছ টিউব নেন। টিউবের ছিদ্রের সঙ্গে নিচের দিকে খাড়াভাবে আরেকটি টিউব জুড়ে দেন। এরপর ছিদ্রের এক পাশে খাবার রাখেন। এরপর একটা ফিঞ্চ পাখি আর শিম্পাঞ্জিকে খাবারটি বের করতে দেন। দেখা যায়, শিম্পাঞ্জি খাবার বের করতে গিয়ে ছিদ্রে ফেলে দেয়। ফলে খাবার হারিয়ে যায়। পক্ষান্তরে ফিঞ্চ পাখি একটা কঞ্চির সাহায্যে খাবারটি বের করে নিয়ে আসে।

একই রকম পরীক্ষা চালান অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী। তারা নিউ ক্যালডোনিয়ান কাককেও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করেন। দেখা যায়, ৩০টির মধ্যে ২৯টি কাকই গাছের ডালকে নিজেদের সুবিধামতো ভেঙে নিয়ে খাবারটি ঠিকমত বের করে নিয়ে আসছে। ছিদ্রের মধ্যে খাবারটি পড়ে গেলে উদ্ধার করা সম্ভব হবে না- এই কার্যকারণ বুঝতে মানবশিশুর তিন বছর প্রয়োজন হয়। ফলে দেখা যাচ্ছে, ফিঞ্চ কিংবা কাকের বুদ্ধি তিন বছর বয়সী মানব শিশুর সমান।

এছাড়া বিজ্ঞানী দম্পতি দেখতে পেয়েছেন, ওয়েস্টার্ন স্ক্রাব জে পাখিকে খাবার দেয়া হলে তারা অতিরিক্ত অংশটুকু লুকিয়ে রাখে। যদি কখনো এই খাদ্য চুরি হয়ে যায়, সেই আশঙ্কায় পরবর্তী সময়ে পাখিটি খাদ্যকে চোখে চোখে রাখে। পাখিদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক এতো বুদ্ধি কিভাবে ধারণ করে, বিজ্ঞানীরা এর উত্তর এখনো খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এমেরির কথায়, পাখির মস্তিষ্ক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের চেয়ে ভিন্ন। তাদের তথ্য প্রবাহের পদ্ধতিও ভিন্ন, তবে কার্যকর।

মোস্তফা রাশেদ